তানজীনা ইয়াসমিন

বকুল বিছানো পথে

সালিশ বাদ জুমা ধার্য হয়েছে। সূর্য মধ্য গগনে। চৈত্রের কাঠফাঁটা রৌদ্র। মাঠ ফেটে খাঁ খাঁ। এর মাঝখানে বকুলকে দাঁড় করানো হয়েছে। ভোরের ঝরা বকুল বেলা বেড়ে গেলে শুকিয়ে গেলে যেমন হয়, বকুলের ফর্সা গাল মুখ তেমন চুপসানো। ঝরা বকুলে ঘ্রাণ থাকে। কিশোরী বকুলে শুধুই মাংস আর ঘামের গন্ধ। সে বড় পাপী। জাহান্নামি। জেনাকারিনী। তার দিকে তাকানোই পাপ। তবু পুণ্যবানেরা তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে পারে না। দৃষ্টিতে যথাসাধ্য চেষ্টাকৃত ঘৃণা টেনে সরু চোখে তাকে পর্যবেক্ষণ করে। তাদের দৃষ্টি বকুলের ওড়নার লম্বা ঘোমটার ফাঁকে সামান্য দৃশ্যমান নিটোল মুখ থেকে তার পূর্ণ প্রস্ফুটিত দেহ পিছলে গর্ভে নামার সাথে সাথেই 'নাউজুবিল্লাহ, আস্তাগফেরুল্লাহ' জিকির করে নজর পাক সাফ করে। লম্বা বয়ান শুরু হলো। হাদিস কোরআন উদ্ধৃত করে বকুলের পাপাচারের বর্ণনা। জেলেপাড়ার মেয়ে। ষোল বছরের কুমারী। কোন কুক্ষণে সে অন্য অঞ্চলের মহাজনের সাথে মুখে চুন কালী মেখে পেট বাধিয়ে বসে। এত বড় ছিনাল মাগি! এর তো বিরাট কলিজা!! একে তো কালসাপের মত পিষে মারা দরকার। নাহলে তো গোটা গ্রামই এমন পাপে ধ্বংস হয়ে যাবে। লুত (আ.) এর সদম জাতির মত এদের ওপর প্রস্তর বৃষ্টি হবে। ১০১টা দোররা মেরে এই পাপী তাপির দম না বের করলে দোজাহানের অশেষ নেকি কীভাবে হাসিল হয়? সালিশ শুরু হয় ...। তাকে ফেলে দোররা মারবে বলে গর্ত করা হয়েছে। সেই গর্তে বকুলের হাত পিছমোরা করে বেঁধে চুলের মুঠি ধরে টেনেহিঁচড়ে নামানো হচ্ছে ।

গল্প

বকুলের মা হনুফা বেগম সালিশের সবার হাতে পায়ে ধরতে চাচ্ছেন। কিন্তু তার হাত সরছে না। যেন তার হাত পা তার শরীরের অংশ না। কণ্ঠনালী চিড়েও চিৎকার বের হচ্ছে না।

ধড়ফড় করে ঘুম ভেঙে উঠলেন হনুফা বেগম। গায়ের শাড়ি ব্লাউজ ভিজে শপশপা হয়ে গেছে। কাঁসার জগ থেকে গ্লাসে পানি ঢালতে গিয়ে পানি পড়ে ঘরময়। আওয়াজে বকুলের ঘুম ভাঙে। উঠে আসে। হনুফা বেগম বকুলের পেটের দিকে নজর করে। এখনও পেট ভাসে নাই। কিন্তু আর কয়দিন? এই মেয়েকে তিনি কই নিয়ে লুকাবেন কি করবেন সাত পাঁচ ভেবে পানির অপর বসে পরে কাঁদতে থাকেন। আজানের ধ্বনি ভেসে আসে। কান্না প্রশমিত করতে করতে অজু করতে ওঠেন। বকুল অজুর বদনা ভরে এনে দাঁড়ায়। এক লাথি মেরে পানি ফেলে দেন হনুফা।

- হারামজাদি। তুই মরিস না ক্যান মাগি? তোর হাতের পানিতে অজু হইব? ভাগ। চক্ষের সামনে থেকে এক্ষণ সর। তোর মত মাগির মুখ দেখলেও অজু নষ্ট। বকুল দ্রুত সরে কোনায় দাঁড়িয়ে নিঃশব্দ কাঁদতে থাকে। সে আজ নিজেও মনে করে তার মরণ ছাড়া গতি নাই। নামাজ শেষে জায়নামাজে বসে চোখের পানি ফেলে অজিফা পড়তে পড়তেই হঠাৎ মাথা খোলে হনুফার। মসজিদের অস্থায়ী মুয়াজ্জিন ইউসুফ মিয়া। ভিনদেশি মানুষ। মসজিদে থাকেন। তিনবেলা তাঁর আর ইমাম সাহেবের জন্য হনুফা বেগমের বাড়ি থেকে খাবার যায়। বকুলের বাবা অকালে

মারা গেলেও ছোট পরিসরে তার মাছ চাষের ব্যবসা ততদিনে দাঁড়িয়ে গেছে। হনুফা বেগম গরিব ঘরের মেয়ে। পরিশ্রম করে হাল ধরে রাখতে পেরেছেন। ভালো মানুষ বকুলের বাবা বেঁচে থাকতেই মসজিদের ইমাম আর মুয়াজ্জিনের বার মাস খাবারের বন্দোবস্ত করে গেছেন। বকুলের মাও তা চালু রেখেছেন। মুয়াজ্জিন ইউসুফ মিয়া আজন্ম হাপানির রোগী। হাওয়া বদল করতে নদীর তীরে চর এলাকায় এসেছেন । আপাতদৃষ্টিতে তাকে ভাল বংশের অতি সজ্জন এক মানুষ মনে হয়। বকুলের মা কথা বলেন কম। তবুও বুদ্ধি পরামর্শ বা কোন আলাপ করতে ভীনদেশি ইউসুফ মিয়াকে তার অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য মনে হয়েছে এই মাস কয়েকেই। কথায় বলে যে আপনের চেয়ে পর ভালো ।

দুপুরে খেতে এলে হনুফা বেগম আসল কথার আগে নকল কথা পাড়ে। ভূমিকা হিসেবে। পরিবার ঘর বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করেন।

ভালো গেরস্তি পরিবার ইউসুফের। ভাই-ভাবী নিঃসন্তান। দুই বোনের এই পাড়ে বিয়ে হয়েছে। বাবা-মা বেঁচে নেই। এসব কথায় হনুফার কিছুই এখন আসে যায় না। তার মেয়ে এখন আর পাত্রস্থ করার জো নাই। তার উদ্দেশ্য কোনো একভাবে বকুলকে এই গ্রাম থেকে সরানো। অন্তত মেয়েটা জানে যেন বেঁচে যায়। শুধু বকুল না, তার নিজেকেও বাঁচাতে হবে। বকুলের বাপ মরার পর থেকেই গ্রামের লোক আর লতায় পাতায় আত্মীয় তার ছেলে নাই অজুহাতে তাঁর স্বামীর জায়গা জমি জবর দখলের চেষ্টা কম চালায় নাই। মেয়ের কুকীর্তি জানাজানি হলে এক উছিলায় মা মেয়ে দুজনকেই একত্রে গ্রামছাড়া করে ফেলবে, তাতে কোনো সন্দেহই নাই। কিন্তু কি বলে তার অবিবাহিত মেয়েকে অন্যত্র পাড় করবেন তা তার বুদ্ধিতেই কুলাচ্ছে না। তার এই উদ্ভ্রান্ত চোখ মুখ আর এলোমেলো প্রশ্ন ইউসুফের নজর এড়ায় না।

-মা, আপনি কি কিছু বলতে চান?

- উ? না আসলে কেম্নে যে কথাটা বলি...

- মা, আপনি আমাকে যে যত্ন করেন তা পেটের সন্তানের থেকে কোনো অংশে কম না। সন্তানের কাছে সংকোচ কেন করবেন? হনুফা বেগম তবুও কুলিয়ে উঠতে পারেন না।

- না বাবা, আসলে...

-আপনি কি আপনার মেয়ের বিষয়ে কিছু বলবেন? হনুফা বেগম প্রচণ্ড চমকে ওঠেন। মেয়েকে গত কয়েক দিন তিনি বাড়ি থেকে বের হতে দেননি। কিন্তু ইউসুফ তো বাড়ির ভেতর মাঝে মাঝে আলাপ করতে বসেছে। তার কি সেই দিকে নজর গেল? জবাব না পেয়ে খাবারের পাত থেকে মুখ না তুলেই ইউসুফ বলে, -আমি বকুলকে এক সন্ধ্যায় সেই বিদেশির নৌকা থেকে নামতে দেখেছি। হনুফা বেগম শিউরে উঠলেন! ইন্নালিল্লাহ!! আর কে কে তাহলে দেখেছে কে জানে। ইউসুফই আবার মুখ খুলল,

-আমি আপনাকে হুঁশিয়ার করতে চেয়েছি। ততদিনে আপনি বোধহয় জেনেও গেছেন, কারণ হনুফাও আর বাড়ি থেকে বের হয়নি, বিদেশীও এর পরপরই তার নৌকা নিয়ে ফিরে গেছে। আর লুকানোর উপায় নাই। হনুফা বেগম এবার আহাজারি করতে থাকেন। মেয়েটা তার ছোট থেকেই কত লক্ষী, পরিশ্রমী আর সরল ছিল। মায়ের হাতে হাতে কাজ করে যায়। সেই মেয়ে কীভাবে এত বড় পাপ গোপন করতে পারল! ইউসুফ সান্ত্বনা দেন।

-আপনি কাঁদবেন না। আপনি আমার কাছে কি বলতে চেয়েছেন দয়া করে বলুন। আমি কি করতে পারি আপনাদের জন্য। -বাবারে তুমি আমার মেয়েটারে আগরতলায় নিয়ে যাও। তোমার বাসা বাড়িতে বা যে কোনো জায়গায় কামে লাগায়ে দাও। বইলো ওর স্বামী বাইচে নাই। ও জানে বাইচে যাক। অনেকগুলা সন্তান মরার পর আমার একটাই জীবিত সন্তান সে। অন্তত জানে বাইচে থাকুক। আর জীবনেও যদি ওর মুখ নাও দেখি, তাও সান্ত্বনা সে জানে বাইচে আছে।

-আপনি এটা কি বলছেন? বকুল লেখাপড়া করছে। কি সুন্দর একটা মেয়ে! এত ভালো অবস্থা আপনাদের। আমাদের বাড়িঘরও এত সুন্দর না। আর ও আমাদের বাড়িতে কি কাজ করবে? কাঁচা বয়সে ভুল হয়ে গেছে। ভিনদেশি রূপবান পুরুষ, বয়সে তার দ্বিগুণ। তার কথায় অনেক মোহ। সুন্দর বাঁশি বাজায়, সুন্দর করে কথা বলে, এটা সেটা উপহার দেয়। বকুল সারাদিন কাজ করে, স্কুল করে । নির্বান্ধব থাকে। ভিনদেশি যে তার কামনা মেটাতে তাকে ছলনা করছে বকুল ধরতেই পারেনি। তার জন্য এত বড় শাস্তি তাকে দেবেন না। হিস হিস করে ওঠে হনুফা রাগে।

-আহ! রূপ, বয়স! এই বয়স, রূপ আর কারো ছিল না। কই আমি তো বয়সের ডাকে কারও নাওয়ে উইঠে বসি নাই! তার এত্তটুকু হায়া শরম হুশ জ্ঞান কিচ্ছু নাই! সে আবার স্কুল পাস দিছে! হারামি মেয়ে, তার মরণই দরকার।

-আচ্ছা, আমি যদি তার দায়িত্ব নিয়েই তাকে নিয়ে যাই? হনুফা বেগম হতভম্ব হয়ে যান। তিনি কি ভুল শুনলেন, না ভুল বুঝলেন?

-দায়িত্ব মানে?

-আমি বকুলকে বিয়ে করে নিয়ে যেতে চাই। হনুফা বেগম নিজেই যেন ঘিন্নায় কুঁকড়ে ওঠেন! ছিঃ ছিঃ ছিঃ বাবা তুমি এইটা কি বলো। তোমার মত ভদ্র ছেলের সাথে আমার মেয়ে ত এমনিতেই যায় না...। আমরা জাউলা...

-আপনি আমার পুরো কথা শোনেন। আমার ভগ্ন স্বাস্থ্য, হাপানির যে সমস্যা জানেন, হাওয়া বদলে এখানে ওখানে ঘুরি- সেটা অনেক জটিল সমস্যা। আমার হার্টেও ফুটা। জন্মের পর পরই ডাক্তার বাবা-মাকে বলে দিয়েছেন আমি স্বল্পায়ু, বড়জোর ২৫/২৭ বছর হায়াত। আগরতলায় আমাদের গ্রামের সবাই জানে আমার রোগের কথা। আমার কাছে কেউই তাদের মেয়ে দেবে না। বকুলকে আমার শুরু থেকেই পছন্দ। পাবার সাধ্য কোনো দিন ছিল না। মনে করেন এটাই আল্লাহর হুকুম। আমাদের দুজনের জন্যই এটা দুই তরফের সমঝোতা। কাজেই আমি আপনাকে বা আপনার মেয়েকে দয়া করছি এই ভাবনা মনে রাখার সুযোগ নাই।

১৯৬৯, দেশে যুদ্ধের ডামাডোল। এত আয়োজনেরও অবস্থা নাই। ঘরে কিছু মানুষ ডেকে পোলাও মাংস আর মিষ্টিমুখ করিয়ে তিনি তার যা কিছু জমানো গয়না শাড়ি ছিল সব ঢেলে মেয়েকে তুলে দিলেন। যেন যত দ্রুত পোড়ামুখী চোখের আড়াল হয় তিনি বাঁচেন। এরপর মেয়েকে ঐ বাড়িতে মারুক কাটুক, তিনি জানতে চান না। মেয়ে মানুষের জন্মই কষ্ট করার জন্য। ইউসুফ মিয়ার সাথে বকুলের এতদিন সামান্যই কথা হয়েছে। যেদিন প্রথম ইউসুফ মিয়া তাদের বাড়িতে পা রাখলো সে অবাক হয়ে তার শুদ্ধ কথা, ধীরলয়ে বলা সুন্দর বাংলা শুনে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তার সুন্দর ফর্সা জামা, সুবিন্যাস্ত চুলে কোনোদিন গ্রামের হুজুরদের মত তেল চপচপ করে না। হুজুর মানুষ তার স্বামী হবে এমন দুরাশা কোনো দিন করে নাই। তবু ইউসুফ মিয়ার মত ভালো মানুষ সে স্বামী হিসেবে পাবে এই ভাবনাও কোনোদিন আসে নাই। মা মেয়ের হাড় ভাঙা খাটুনির জীবনে স্বামী বা মনের মানুষ কেমন হবে তা ভাবার সুযোগও আসে নাই। তার আগেই ঝড়ের মত মোক্তার মহাজনের সর্বনাশা বাঁশি তাকে গ্রাস করে ফেলে। মাছ বেচাকেনার কোন ফাঁকে সে মোক্তার মহাজনের ঘোর লাগানো কথার মোহে আটকে চোরাবালিতে ডুবতে থাকে তার হুশ জ্ঞান কিছুই হয় না। যখন হুশ হয়, যখন পেটে সন্তান জানান দেয় তখনই মোক্তারকে বিয়ের আলাপ তোলে, আর জানতে পারে তার পরিবার আছে তার অঞ্চলে। তার বকুলকে বিয়ে করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবে পেট খসানোর সব খরচ, এরপরও চাইলে বকুলের সব খরচ দেবে। বকুলের ঘিন্না নিজের উপরেই হয়। ভীন দেশে স্ত্রীর সাথে আলগা থাকা পুরুষ, সে তো সুযোগ খুঁজবেই। বকুল কোন আন্দাজে তার দ্বিগুণের বেশি বয়সের একজনের সাথে কিছুই না জেনে কলমা পড়ে বিয়ে না করেই তাকে সব দিয়ে বসে আছে! ছিঃ! আর এখন এমন সুফী মানুষটাই বা কোন হিসেবে তার মত অশৌচ এক মেয়েকে বিয়ে করে পরিবারে তোলার জন্য রওনা দিচ্ছে। সে সারাজীবন এই মানুষের পায়ের পরে সেবা করলেও ত দায় মেটে না! পথে তাদের কথা হলো খুব সামান্য। পানি খাবে নাকি, ক্ষুধা পেয়েছে কিনা, শরীর খারাপ কিংবা টয়লেটে যাবে কিনা এইসব। আসন্ন গণ্ডগোলের ডামাডোলে লোকের ভিড় এমনিই পথে অনেক বেশি। কথা এইটুকুই বলা সম্ভব। পথের ক্লান্তির চেয়েও সে আশঙ্কায় আশঙ্কায় বিধ্বস্ত, ইউসুফের পরিবারে ইউসুফ তাকে কীভাবে উপস্থাপন করবে! একদিনের পথে ক্লান্ত যখন তারা ইউসুফদের বাড়ি পৌঁছলো তখন রাত প্রায়। এর মধ্যেও তাদের আগমনের খবর জেনে ইউসুফের ভাই ভাবী ভালো মন্দ রান্না করে ঘর গুছিয়ে আলো জেলে বসে আছেন। ইউসুফের ভাবী ঠিক ইউসুফের মতই। ধোয়া মোছা ফর্সা জামা, সুন্দর স্নো ক্রিমের যত্নে গড়া হাত মুখ। কি আপনের মত তাকে জড়িয়ে ভেতরে ঢোকালো, -আহ! কি রূপ! ঘর আলো হয়ে যায়! এমন একটা মেয়ে পেটে ধরতাম যদি! আল্লাহর কাছে কতদিন দোয়া করেছি ঘরে

একটা সঙ্গী আসুক। তুমিও তো আমার আশা মিটালে না। একটা সতিনও তো আনতে পারো নাই এদ্দিনে? ইউসুফের ভাই জলিল জয়নবের কথায় তাল দেয়,
-আরে রাখো তো। তোমার মত এত রূপগুণের ধারে পাশে কাউকে পাই নাকি!
-আ মরণ! বংশে বাতি নাই, রূপ ধুয়ে পানি খাবে! বকুলের মুখটা দুই হাতের তালুতে মেলে ধরে আদর করে জয়নব,
-যাক, তবু তো ইউসুফ মিয়ার বিয়ের সাথে সাথেই বৌ লক্ষী পেটে সন্তান ধরলো খোদার ইচ্ছায়। বকুল কেঁপে ওঠে। আড়চোখে ইউসুফকে দেখে। কি বলেছে তাদের ইউসুফ? বিয়ে অনেক আগেই করে এসেছে? ইউসুফ শান্ত স্মিত হাসি মাখা মুখে তাকে আশ্বস্ত করতে চায়। জলিল মিয়া তাড়া দেয়,
-যাও যাও গা গসুল সেরে জামা পাল্টে খেতে বসো। জয়নব বিবি, কাল থেকে সারাদিন দুই জায়ে গল্প করো। এখন ওদের বিশ্রাম দরকার। রাতে খাবার পরপরই জলিল মিয়া আর জয়নব যেন তাদের জোর করে শুতে পাঠিয়ে দেয়।
-তোমাদের ঘুম দরকার। আর জানো তো, সকালে ইউসুফকে নিয়ে বের হতে হবে, তার চাকরির একটা ব্যবস্থা দেখবো। অনেক দিন সে এই মুল্লুকে নাই। সবাই তো জানে সে বাংলাদেশেই থেকে যাবে। কাঠের বাড়ি। উপরে টিনের চাল। টুপ টাপ শিশিরের শব্দ। বাইরে ঝিঁঝির ডাক। হারিকেনের আলো উস্কে বকুল টিনের বাক্স খুলে সুতির শাড়ি বের করে। মা খুব যত্ন করে তাকে আসার সময়ের তাড়াহুড়োতেও বুঝিয়ে দিয়েছে কীভাবে এই সময়ে নিজের যত্ন নিতে হয়, স্বামীর যত্ন করতে হয়। কীভাবে সহবাস করতে হয়, যেন সে কুমারী মেয়ে! মা এও বুঝিয়ে দিয়েছে সন্তান পেটে নিয়ে সহবাসে কি করে করা যায়, কারণ পুরুষের শরীরের চাহিদা থাকে। স্ত্রীকে স্বামীর কর্মক্লান্ত শরীরের ধকল জুড়াতে জানতে হয়। না হলে সে অন্যত্র সুখ খুঁজে ফিরবে। পুরুষদের সুযোগ অনেক। ঘরের ভেতর ইউসুফ মিয়ার সামনে সে কি করে শাড়ি পাল্টাবে বুঝে উঠতে পারে না। ইউসুফ মিয়ার সেদিকে খেয়াল হতেই হারিকেনের বাতি কমিয়ে দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লো। শাড়ি পাল্টে মায়ের দেয়া স্নো পাউডার মেখে মাথা আচড়ে খুব সন্তপর্ণে শুয়ে গেলো বকুল। বুকের ভেতর হাজার ভাবনার ডামাডোল। ভাই ভাবী আর গ্রামের জ্ঞাতি আত্মীয়কে যাই বলুক, ইউসুফ জানে বকুল কি। তার কি বকুলের পাশে শুতে ঘিন্না লাগছে? সে কি কোনোদিন তাকে মন থেকে মেনে নিতে পারবে? আর তার সন্তানকে? সে যদি বকুলের সাথে সহবাস করেও বা সে হয়তো শরীরের চাহিদায়। তার মন কি বকুলকে কোনোদিন গ্রহণ করবে? সে ইউসুফ মিয়ার দিকে ফিরেই শুলো। মা তাকে যেভাবে বলেছে। ইউসুফ মিয়ার শরীর জেগে উঠলে তাকে সাড়া দিতেই হবে। প্রস্তুত থাকতে হবে। রীতিমাফিক এটাই তাদের প্রথম রাত। সে শোবার সাথে সাথেই ইউসুফ মিয়া তার দিকে ফিরলো। কণ্ঠ নামিয়ে বললো,
- শরীর কি খুব খারাপ লাগছে? সব ঘরে পাতলা দরজা। ফিসফিস করে কথা না বললে পাশের ঘর থেকে শুনতে পারার কথা। বকুল ফিস ফিস করেই জবাব দিল।
-জী না, আমি ভালো আছি। সে চেষ্টা করলো ওদের মতো শুদ্ধ করে কথা বলতে।
-এত বড় জার্নি করতে হলো এই শরীরে, কাল সারাদিন বিশ্রাম করো। ভাবী খুব ভালো মানুষ। এমন না যে তোমাকে কাল সকালে থেকেই কোমর বেঁধে সংসারের কাজে নামতে হবে।
- আপনিও তো কাল থেকেই কাজে যাবেন।
-আমি তো সন্তান সম্ভবা না বকুল। বকুল কিছুক্ষণ কথা বলতে পারলো না। কি করে জিজ্ঞেস করে বুকে অনেক কিছুর তোলপাড় চলছে। - কি ভাবছ?
-নাহ...। এই...।
-বলো!
-আপনার আমাকে ঘিন্না হচ্ছে না? আমার পেটে যে আছে তাকে? ইউসুফ উঠে বসে আলো উস্কে থমকে বকুলের দিকে তাকিয়ে থাকে কিছুক্ষণ। ফের শুয়ে কণ্ঠ না তুলেই বললো,
- ঘিন্না হলে বিয়ে করলাম কি করে বকুল? মাসুম বাচ্চা তাকে কেন ঘিন্না করব? যদি সেই বাচ্চা ধর্ষণের মাধ্যমেও আসত তাহলেও সে মাসুম, তার

ইউসুফের হাত নরম স্পর্শে ধীরে ধীরে বকুলের শরীরের উপরে উঠে আসে। তার পূর্ণ প্রস্ফুটিত শরীরে এত নরম এত যত্নের স্পর্শ মোক্তার মহাজন কোনোদিনই দেয়নি। তার স্পর্শ ছিল কামনার আগুনে ছারখার করা। ক্ষুধার্থ বুভুক্ষু মানুষের দংশন । ইউসুফ তাকে এভাবে স্পর্শ করছে যেন সে ফুলের নাজুক পাপড়ি, খুব জোর স্পর্শে মুচড়ে যাবে। ইউসুফের তপ্ত নিঃশ্বাস তার চোখে মুখে পড়ছে। একবার তার দেখতে ইচ্ছে হলো সত্যি সত্যিই তার চোখে কি আছে- কামনা না ঘৃণা? ইউসুফের শান্ত গভীর চোখ অনেক মায়া নিয়ে বকুলকে দেখছে

তো কোনো দোষ নাই। বকুলের চোখের পাতা বন্ধ করে বলে, -ধর্ষণের মাধ্যমে যেই সন্তান আসে তার মাকে তো আপনি দোষী ভাবতেন না। কিন্তু আমি তো পাপী। আমি তো দোষী! ইউসুফ হাসেন। খুব সন্তর্পণে তার হাত বকুলের গর্ভের উপর রাখে।
-তুমি কি ভালোবেসে তার কাছে যাও নাই? এই সন্তানও ভালোবাসার সন্তান। তুমি আমার রোগ জেনে স্বল্পায়ু জেনেও যেভাবে আমাকে গ্রহণ করেছ, আমি তোমার অতীত জেনে গ্রহণ করেছি। আমাদের জীবনে একসাথে কতদিন আছে আমরা জানি না। এত অল্প সময় তোমার অতীত যাতনায় আর আমার ভবিষ্যতের আশঙ্কায় কি কাটানো উচিত? আমাদের প্রতিটা মুহূর্ত কি অনেক বেশি ভালোবাসাময় সুখময় হওয়া উচিত না? ইউসুফের হাত নরম স্পর্শে ধীরে ধীরে বকুলের শরীরের উপরে উঠে আসে। তার পূর্ণ প্রস্ফুটিত শরীরে এত নরম এত যত্নের স্পর্শ মোক্তার মহাজন কোনোদিনই দেয়নি। তার স্পর্শ ছিল কামনার আগুনে ছারখার করা। ক্ষুধার্থ বুভুক্ষু মানুষের দংশন । ইউসুফ তাকে এভাবে স্পর্শ করছে যেন সে ফুলের নাজুক পাপড়ি, খুব জোর স্পর্শে মুচড়ে যাবে। ইউসুফের তপ্ত নিঃশ্বাস তার চোখে মুখে পড়ছে। একবার তার দেখতে ইচ্ছে হলো সত্যি সত্যিই তার চোখে কি আছে- কামনা না ঘৃণা? ইউসুফের শান্ত গভীর চোখ অনেক মায়া নিয়ে বকুলকে দেখছে। তার হালকা দাঁড়ি গোঁফের ফাঁকে পাতলা ঠোঁটে স্মিত হাসি। এমন কোনোদিন তার জীবনে আসবে ভেবে সে অনেক শিহরিত হতো। পরক্ষণেই দীর্ঘশ্বাস উঠে আসতো। বকুলদের গ্রামে সে থাকতে যায়নি। যেদিন প্রথম সেই গ্রামে পা রাখে পুকুর পাড়ে বকুলকে দেখে সে থমকে যায়। আহা! কি মায়া! এমন কাউকে সারাজীবন দুই চোখে দেখতে পেলেও জীবনের হাহাকারটা মিটে যেত! রোগটা তার এমন বাড়িয়ে ফেনিয়ে হনুফা বেগমকে বলাতে খুব বেশি কি পাপ ছিল? তার নিয়তে তো কোনো পাপ ছিল না। দয়াময় বড়ই মেহেরবান। এতটুকু তিনি নিশ্চয়ই মওকুফ করেছেন। তাই আজ এমন ভোরের শিশিরে মাখামাখি বকুলের মত সুন্দর মেয়েটা তার বৌ হয়ে তার সমস্তটা নিয়েই তার পাশে! ইউসুফের শরীর জেগে উঠেছে তীব্রভাবে। বকুল চোখ মেলতেই ইউসুফ আরো ঘন হয়ে কানে ঠোঁট রেখে ফিস ফিস করে ডাকে, -বৌ! -হু? -বাতিটা নিভিয়ে দেই? ৯৩